Reg. No. DA.—142

এই সংখ্যায় আছে—

নবী, কবি ও দার্শনিক	১ পৃষ্ঠা
রমজান মাসে	২—৩ "
আদম সন্তানের আজাদী....	৪—৫ "
বয়ানুল-কুরআন	৬—৭ "
আখবার-আহমদীয়া	৮ "

পাক্ষিক

আহমদী

পূর্ব্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক আহমদীয়া আঞ্জুমানের মুখপত্র।

মে, '৫৫ ; বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬২

নব পর্য্যায়—৯ম বর্ষ, | Fortnightly Ahmadi, May, '55 | ১—২ সংখ্যা

সম্পাদকীয়

নবী, কবি ও দার্শনিক

নবীগণ প্রত্যেক মানুষকে ডেকে বলেন,—ওঠো, জাগো, আমার কথা মত চল; অন্যথা বিপদে পড়বে। "আমি তোমাদেরই মত একজন মানুষ; আমার প্রতি ঐশীবাণী হ'য়েছে—তোমাদের উপাস্য একমাত্র আল্লাহ ভিন্ন আর কেহ নয়। যে কেহ তাঁহার সাক্ষাৎ চায়, তাহার কর্ত্তব্য সঙ্গত কাজ করা এবং তাঁহার উপাসনায় আর কাহাকেও অংশীদার না করা" (কোরআন, সুরা ১৮ : আয়াত ১১০)।

এই বাণী যুক্তির সহিত স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করা নবীদের দায়ীত্ব; এর বেশী আর কোন দায়ীত্ব তাঁহাদের থাকে না। (কোরআন, ৫ : ৯২, ৯৯; ১৩ : ৪০; ১৬ : ৩৫, ৮২; ২৪ : ৫৪; ২৯ : ১৮; ৩৬ : ১৭; ৪২ : ৪৮; ৬৪ : ১২ ইত্যাদি)।

বর্ণনা প্রণালীর কলা কৌশল ও ভাষার হৃদয়-গ্রাহীতা কবি ও সাহিত্যিকদের বৈশিষ্ট্য। এর আশ্রয় নবীদিগকেও নিতে হয়। এই কারণে অনেকে নবীকে কবি মনে করেছে।

কোরআন শরীফ হইতে দেখা যায়, নবী শ্রেষ্ঠ মহম্মদ ছঃ আঃ অছাল্লামকে তাঁহার বিরোধিগণ কবি মনে করেছিল। তারা বলত,—"সে কবি; আমরা অপেক্ষায় আছি কালপ্রবাহে সে বিলীন হবে" (২১ : ৫; ৫২ : ৩০); "একটা পাগলা কবির কথা মত আমাদের দেবতাদিগকে ছেড়ে দিব?" (৩৭ : ৩৬)। এর উত্তরে আল্লাহ বলেছিলেন—"আমরা তাঁকে কবিতা শিখাই নাই; ইহা তাঁর উপযুক্ত নয়। তাঁকে যা শিখিয়েছি সেটা হচ্ছে স্মৃতি ও স্পষ্ট কোরআন (পাঠ্য)" (৩৬ : ৬৯); "কোরআন কবির কথা নয়" (৬৯ : ৪১)। কবিদের নিন্দায় কোরআনে বলা হয়েছে,—"শয়তানরা কার ঘাড়ে চাপে তোমাকে জানাব কি? তারা চাপে প্রত্যেক মিথ্যাবাদী পাপীর উপরে; তারা শোনা কথা বলে; তাদের অধিকাংশই মিথ্যা কথা বলে। আর তারা চেপে বসে কবিদের ঘাড়ে, মূঢ় লোকেরা যাদের অনুসরণ করে। তুমি কি দেখতে পাও না যে তারা (কবিগণ) সব উপত্যকায় ঘুরে বেড়ায় এবং তাদের কথা এক, কাজ অন্য? তবে এর ব্যতিক্রম আছে—যারা ঈমান আনে, সঙ্গত কাজ করে, আল্লাহকে খুব স্মরণ করে, এবং অত্যাচারিত হোলে আত্মরক্ষা করে।" (২৬ : ২২১—২৭)।

আমাদের যুগে রাজনৈতিকদের ভাড়াটিয়া লেখক ও বক্তাগণ যা করে থাকে, রসুলুল্লার সময়ে আরবে সেই কাজটা করত আরব কবিগণ। আমরা এখন সাহিত্যিক বলতে যা বুঝি, তখনকার আরবে তা ছিল না; ছিল শুধু কবি। তাদেরকে কোরআনে নিন্দা করা হয়েছে তাদের কবি হওয়ার কারণে নয়; তাদের কবিতায় নৈতিক আদর্শ না থাকার কারণে; তাদের কথা ও কাজ সামঞ্জস্যহীন হওয়ার কারণে; নৈতিক উচ্চ আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা না করার কারণে। এই সব দোষ যে সকল কবির মধ্যে নাই, কোরআন তাদেরকে এই নিন্দার বাহিরে রেখেছে ব্যতিক্রমের উল্লেখ কোরে। বহু আলেম আছেন, যারা কবি হওয়াকে ভাল মনে করেন না, বরং নিন্দা করেন, কোরআনে উল্লিখিত এই ব্যতিক্রমের প্রতি দৃষ্টি না রাখার কারণে। স্মরণ রাখতে হবে,—রুমী, সাদী, হাফেজ প্রভৃতি ইসলামের গৌরব বহু মনিষীই কবিতা লিখে গেছেন; জবুর কেতাব উৎকৃষ্ট কবিতা।

জগতের বিভিন্ন লোকের বিভিন্ন অভিজ্ঞতা এক সঙ্গে বিচার করে দেখা এবং তার মধ্যে বিরোধ থাকলে তাহা দেখাইয়া দেওয়া দার্শনিকের কাজ। দার্শনিক কাহাকেও মিথ্যাবাদী মনে করেন না। দুই ব্যক্তি দুই বিপরীত অভিজ্ঞতার দাবী করলে তাদের একজনকে বা উভয়কেই ভ্রান্ত মনে করেন।

ইন্দ্রিয় আমাদের সামনে যা কিছু উপস্থিত করে,—যা আমরা দেখি, শুনি, স্পর্শ করি, জিহ্বা দিয়া চেখে দেখি বা নাকে যার ঘ্রাণ পাই,—বুদ্ধির সাহায্যে তা আমরা বিচার করে দেখি, এবং বুদ্ধি যেটাকে শুভ বলে সেটা করতে প্রস্তুত হই; যেটাকে অশুভ বলে তাহা বর্জন করি।

সব মানুষের কর্ম্মক্ষেত্র ও অভিজ্ঞতা এক নয়; সমানও নয়। আমরা প্রত্যেকেই বিচার করি নিজ নিজ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা অনুযায়ী এবং যে বিষয়ে আমাদের অভিজ্ঞতা নাই, সে বিষয়ে যাদের অভিজ্ঞতা আছে তাহাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি।

মানব জাতির সামগ্রীক অভিজ্ঞতা এক সঙ্গে বিচার করা সহজ ব্যাপার নহে। দার্শনিকগণ ইহাই চেষ্টা করেন। বিভিন্ন লোকের অভিজ্ঞতার স্বরূপ বুঝতে তাদেরও ভুল হয়। এই কারণে তাদের মধ্যে পরস্পর বহু বিরোধ দেখা যায়। তবে তাঁদের এই চেষ্টার ফলে মানব সমাজ যে বহু ভুল ধারণা হতে মুক্ত হতে পারছে, একথা অস্বীকার করা যায় না।

কোরআনের কোথাও দর্শনকে নিন্দা করা হয় নাই। হাঁ, 'কাহেন' বা গণকদের নিন্দা করা হয়েছে। কাহেনগণ ঠিক দার্শনিক নয়; তাদের গণনার পিছনে নির্ভরযোগ্য তেমন কোন বিজ্ঞান থাকে না। যে সব দার্শনিকের উক্তির পশ্চাতে নির্ভরযোগ্য জ্ঞান-বিজ্ঞান থাকে না, কাহেনদের ন্যায় তারাও নিন্দার পাত্র।

নবীগণ কাজ করেন তাদের বিশিষ্ট ক্ষেত্রে। কোরআনে নবীর কাজের তালিকা দেওয়া হ'য়েছে—(১) আল্লার বাণী শুনান বা নিদর্শন বর্ণনা করা; (২) সমাজকে পবিত্র করা; এবং (৩) জ্ঞান ও বিধান শিক্ষা দেওয়া।

তৃতীয় কাজে নবীকে দর্শনের আশ্রয় নিতে হয়।

ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রে কোরআনে বার বার বলেছে—'তোমরা বুদ্ধিবৃত্তির ব্যবহার কর, ভাবিয়া দেখ, বুঝিয়া দেখ, যদি তাহারা বুদ্ধি প্রয়োগ করত'। যারা বুদ্ধিবৃত্তির ব্যবহার করে না, কোরআন তাদেরকে পশুর সঙ্গে তুলনা করেছে।

নবী আর দার্শনিকের মধ্যে একটা বড় রকমের প্রভেদও আছে। চক্ষু, কর্ণ ইত্যাদি ইন্দ্রিয় উভয়েরই আছে এবং উভয়েই পূর্ণ মাত্রায় এগুলির ব্যবহার করেন। জ্ঞান আহরণের জন্য আর একটা ইন্দ্রিয় আছে যা শুধু নবীদেরই আছে, দার্শনিকদের নাই। সেই অতিরিক্ত ইন্দ্রিয় হচ্ছে নবীদের 'অহি-ইলহাম' বা ঐশীবাণী। চক্ষু, কর্ণ, ইত্যাদি ইন্দ্রিয় ভুল ধারণা সৃষ্টি করতে পারে। নবীদের ঐশীবাণী অভ্রান্ত।

বহু দার্শনিক আছেন, যাদের মতে 'ঐশীবাণী' ব'লে কোন নির্ভরযোগ্য স্বত্তা নাই। নিদ্রাকালে বা জাগ্রত অবস্থায় যে স্বপ্ন দেখা যায়, মনের মধ্যে হঠাৎ যে কথা খেলে যায়, অপ্রত্যাশিত বা অসাধারণ-ভাবে মুখ দিয়া যে সব কথা নির্গত হয়, সেগুলিকে তারা তেমন কোন নির্ভরযোগ্য বস্তু মনে করেন না। তাদের এইরূপ মনে করার পশ্চাতে অবশ্যই একটা প্রবল কারণ আছে। এই কারণ দূর করতে চেষ্টা করা ঐশীবাণীবাদে আস্থাবান লোকদের একটা বড় কর্ত্তব্য। (অবশিষ্টাংশ ৮ম পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

রমজান মাসে

(১)

রমজান মাসে রোজা রাখা প্রত্যেক ঈমানদার নরনারীর জন্য ফরজ। তবে এই মাসে যারা পীড়িত থাকে বা প্রবাসে থাকে, তারা অন্য মাসে রোজা রাখবে। অপরিণত বয়সের ছেলে মেয়েদের জন্য রোজা রাখা যে ফরজ নয়, তা বলাই বাহুল্য। রোগী কে, প্রবাসী কে, এ নিয়ে ফকীহীদের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ দেখা যায়। আসলে এ প্রশ্নের মীমাংসা অনেকটা নির্ভর করে ব্যক্তিগত বিবেকের উপরে। যার ঈমান দুর্ব্বল, সে রোজা এড়াবার বাহানা করে। আর যাদের ঈমান অন্ধ আবেগভিত্তিক, তারা রোজা রেখে দৈহিক বিপদ টেনে আনাকে মহাপুণ্যের কাজ মনে করে। 'ছিরাতল-মুস্তাকীম' বা সরল পথ এতদুভয়ের মাঝামাঝি।

পহেলা রমজানের চাঁদ দেখার পর বা চাঁদ উঠেছে জানার পর 'মুত্তাকী' হওয়ার উদ্দেশ্যে রোজা রাখবার সঙ্কল্প করতে হয়। এ সঙ্কল্প যাদের নাই, তাদের রোজা রাখা অর্থ বৃথা দৈহিক কষ্ট স্বীকার করা বৈ আর কিছু নয়।

নৈশ অন্ধকারের অবসানে ঊষার আলোক-রেখার বিকাশ যখন আরম্ভ হয়, তখন হইতে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত পানাহারে সম্পূর্ণরূপে বিরত থাকা রোজা রাখার দৈহিক প্রতীক। চিন্তায়, কথায় ও কাজে যাবতীয় পাপ পরিহার এবং যথাসাধ্য পুণ্যের অনুশীলনকে কোরআনের পরিভাষায় 'তাকওয়া' বলা হয় এবং তাকওয়াবান ব্যক্তিকে বলা হয় মুত্তাকী। 'মুত্তাকী' হওয়াই রোজার উদ্দেশ্য। যে ব্যক্তি যাবতীয় পাপ পরিহার এবং যাবতীয় পুণ্যের অনুশীলনে যত্নবান নহে, সে নিশ্চয়ই 'মুত্তাকী' নহে। সে সারাদিন পানাহারে বিরত থাকলেও কোরআন-সম্মত রোজা পালন করে না।

(২)

মুসলমানদের দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক ইত্যাদি সাময়িক পত্রিকাগুলি এবং বহু পুস্তক রমজানের মাহাত্ম্য-মুখর। আমাদের সমাজনেতা ও রাষ্ট্রনেতাদের মুখেও রোজার বহু মহিমার কথা শুনতে পাওয়া যায়। কোরআন হাদীসেও সত্যই রোজার বহু উপকারীতা বর্ণিত হয়েছে। 'আহমদীর' এই সম্পাদকীয় সন্দর্ভে তার কিছুটা লিখব মনে করে কলম ধরে এখন একটা মহাসমস্যায় পড়েছি।

বহু মুসলমান বাহানা কোরে রোজা করে না বা সারা মাস রোজা করে না। তবে যারা সারা মাস রোজা করে, তাদের সংখ্যাও বিপুল। যারা বাহানা করে রোজা রাখে না বা যারা মুসলমান নয়, তারা জিজ্ঞাসা করে, এত মুসলমান রোজা করা সত্ত্বেও অপর সমাজের তুলনায় মুসলমান সমাজে 'তাকওয়া' বেশী দেখা যায় কৈ? এ প্রশ্নের কি উত্তর দিব?

(৩)

রোজা বা উপবাস ব্রত পালন শুধু ইসলামেরই বিধান নয়। ঐশীবাণীভিত্তিক ধর্ম্মসমূহের মধ্যে ইসলাম সর্ব্বকনিষ্ঠ। ইসলামের পূর্ব্ববর্ত্তী প্রত্যেক ঐশীবাণীভিত্তিক ধর্ম্মেই রোজা বা উপবাস ব্রত পালনের বিধান রয়েছে। সুতরাং এর বাস্তব উপকারীতা সপ্রমাণ করবার দায়ীত্ব শুধু মুসলমানেরই নয়; এ দায়ীত্ব ইহুদি, খৃষ্টান, হিন্দু, মুসলমান নির্ব্বিশেষে প্রত্যেক ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তির উপরে সমানভাবে রয়েছে। তবে একটা হেতু আছে যার জন্য পুরাতন ধর্ম্মগুলির লোকদের তুলনায় মুসলমানদের দায়ীত্ব এ বিষয়ে কিছুটা বেশী এবং ইসলামের বিভিন্ন ফেরকার মধ্যে আহমদীদের দায়ীত্ব সবচেয়ে বেশী।

ইসলামের ঐশীগ্রন্থ কোরআন অবিকল রয়েছে। সুতরাং কোন মুসলমানই এ কথা অস্বীকার করতে পারে না যে 'মুত্তাকী' হইতে পারা রমজানের রোজা পালনের উদ্দেশ্য। পক্ষান্তরে, কোরআনের পূর্ব্ববর্ত্তী কোন ঐশীগ্রন্থই অবিকল নাই। এই কারণে অপর ধর্ম্মাবলম্বী লোকেরা উপবাসের উপকারীতা নৈতিক উৎকর্ষ না বলে মনগড়া অন্য কথা বলতে পারে। মুসলমানদের মধ্যে যারা আহমদী নয়, তারাও নৈতিক উৎকর্ষের দিকে না গিয়া 'মুত্তাকী' শব্দের অর্থ ইসলামের জাহেরী আচার অনুষ্ঠান ও রীতি নীতি পালনের দিকে ফিরাতে পারে। আহমদীদের পক্ষে তা সম্ভব নয়। রোজার উদ্দেশ্য ব্যাখ্যায় আহমদীয়া জামায়াতের প্রতিষ্ঠাতা নৈতিক উৎকর্ষের উপরেই জোর দিয়াছেন।

(৪)

কোরআন করীমের যে আয়াতগুলিতে রোজার আদেশ দেওয়া হইয়াছে, এই সংখ্যা আহমদীর অন্যত্র তার বাংলা অনুবাদ দেওয়া গেল। এগুলি সুরা বকরের ১৮৩-৮৭ আয়াত। রোজার উদ্দেশ্য এবং উপকারীতা বুঝবার জন্য প্রথমতঃ এই আয়াত-গুলির প্রতি গভীর মনযোগ দেওয়া আবশ্যক। তারপর এই আয়াতগুলির পূর্ব্বে ও পরে এই সুরায় যা বলা হইয়াছে, তাহা লক্ষ্য করা আবশ্যক। পূর্ব্ব-পর আয়াতগুলি হইতেও রোজার আবশ্যকতা এবং বাস্তব উপকারীতা সম্বন্ধে যথেষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

এভাবে কোরআনের প্রতি মনযোগী হোলে প্রত্যেক ব্যক্তিই কতকগুলি সিদ্ধান্তে উপনীত হোতে পারেন। তবে শাস্ত্রভিত্তিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া এক কথা; আর শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্তের বাস্তবতা সপ্রমাণ করা অন্য কথা। বাস্তবতা প্রমাণের জন্য চাই সাধকের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মহিমাময় প্রকাশ। সাধক যেখানে মহিমাবিহীন, তার সাধনাকে কেউ বড় জিনিষ মনে করতে পারে না। সুতরাং রোজার মহিমা প্রমাণ করতে হোলে একদিকে যেমন কোরআন হইতে শাস্ত্রীয় যুক্তি বা 'নকলী দলীল' দেওয়া আবশ্যক, অপর দিকে রসুলুল্লাহ ছঃ এবং তাঁহার সমকালীন ও পরবর্ত্তী ইসলামনিষ্ঠ মহাপুরুষদের জীবন মহিমা দেখান আবশ্যক।

ধর্ম্মের ব্যাপারে চুলচেরা বিচার বিশ্লেষণ করাকে হয় ত অনেকেই অনাবশ্যক মনে করবেন। তারা বলবেন, খোদা আদেশ দিয়েছেন রোজা করতে, এ আদেশ অবশ্যই পালন করতে হবে; পালন করলে মরণের পর বেহেস্ত নসীব হবে; না করলে দোজখে যেতে হবে; এ নিয়ে এত চুলচেরা বিচার কেন?

এই শ্রেণীর ধারণা যে একেবারেই উড়াইয়া দেবার জিনিষ তা নয়। সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন বা ধর্ম্ম যে কোন বিষয়েই আমরা পারদর্শী হোতে চাই না কেন, দুইটি স্তর অতিক্রম করা প্রত্যেকের জন্যই অপরিহার্য্য। কিছুকাল বিনা বাক্যে গুরুর আদেশ অনুসরণ করতে হয়; তাঁরা যা করতে বলেন তাহাই করতে হয়। যে সব ছেলে এরূপ করে না, তাদেরকে বলা হয় বখাটে ছেলে! প্রত্যেক বিষয়েই কিছুকাল বিনা বাক্যে গুরুর আদেশ পালন করতে থাকা মানব মাত্রেরই জীবনের প্রথম স্তর। নাবালেগদের জন্য এর অন্যথা করা অপরাধ। যারা উল্লিখিত ধারণা পোষণ করেন, তারা এই প্রথম স্তরের লোক। অন্য কথায়, তারা ধর্ম্মীয় নাবালেগ।

পরমায়ু শত বৎসর হোলেও অনেকে আমরণ নাবালেগ থাকে। আর কতক লোক আছে, বয়োবৃদ্ধির সাথে যাদের মনে গুরুর শিখানো কথা সম্বন্ধে বহু সংশয় ও প্রশ্নের উদয় হোতে থাকে। এইভাবে সংশয় ও প্রশ্ন জাগা জীবনের দ্বিতীয় স্তর। এ স্তরে যারা পৌছে গেছে, তারা প্রশ্ন করবেই; প্রশ্ন না করা তাদের পক্ষে অসম্ভব। এটা নিন্দনীয় নয়, বরং এর কল্যাণেই মানব সমাজে জ্ঞানের পরিধি ক্রমাগত বিস্তৃততর হচ্ছে। সংশয় ও প্রশ্ন না থাকলে মানব সমাজ আজও আদি পিতা আদমের যুগেই থাকত।

পীড়িত বা প্রবাসী না হওয়া সত্ত্বেও রমজান মাসে যে সকল মুসলমান রোজা করে না, তাদের রোজা না রাখার কারণ দৈহিক কষ্ট স্বীকারের অনিচ্ছা নয়; রোজার সার্থকতা সম্বন্ধে সন্দেহই এর কারণ। দৈহিক কষ্টভোগ নাই কোন কাজে? যারা রোজা রাখেনা,—বিদ্যা-শিক্ষা, রুজি-রোজগারের চেষ্টা, এমন কি খেলা ধূলার জন্যও দৈহিক কষ্ট স্বীকার করতে তারা একটুও কসুর করে না। সুতরাং রোজার সার্থকতা সম্বন্ধে সন্দেহই যে এদের রোজা না রাখার কারণ তাহা সুস্পষ্ট।

রোজার মাসে হোটেল রেষ্টুরেন্টগুলি পর্দ্দার আড়ালে বেশ চালু থাকে বোলে অনেকেই ক্রোধ প্রকাশ করেন। এই শ্রেণীর ক্রোধের ফলে পর্দ্দাটা আরো মোটা হোতে পারে, কিন্তু রোজাদারের সংখ্যা যে এতে বাড়বে না তা সুনিশ্চিত। এভাবে ক্রোধ না দেখায়ে রোজার সার্থকতা সপ্রমাণ করতে চেষ্টাবান হওয়াই বুদ্ধিমান ঈমানদার ব্যক্তিদের কর্ত্তব্য।

(৫)

রোজার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কোরআন বলে—(ক) "যেন তোমরা 'মুত্তাকী' হোতে পার"; (খ) "আল্লাহ তোমাদিগকে যে পথ দেখায়েছেন তার জন্য যেন তোমরা তাঁকে বড় বলতে পার"; (গ) "যেন তোমরা আল্লার শোকর করতে পার।"

নিছক দৈহিক কষ্টভোগই যে রোজার উদ্দেশ্য নয়, এ কথা বুঝাবার জন্য কোরআনে বলা হয়েছে, "রোজা করায় তোমাদের কল্যাণ আছে যদি বুঝে দেখ"; "আল্লাহ তোমাদের জন্য তাহাই চান যাহা সহজ, যাহা কঠিন তাহা চান না"। পীড়িত ও প্রবাসী লোকদিগকে অন্য সময়ে রোজা করতে আদেশ দেওয়া এবং সক্ষমদিগকে 'ফিদিয়া'রূপে দরিদ্র ভোজনের অনুমতি দেওয়া আল্লার এই ইচ্ছার অভিব্যক্তি।

রোজার জন্য রমজান মাস নির্দ্দিষ্ট করা হোয়েছে কেন? এর উত্তরে কোরআন বলেছে, "রমজান মাসে কোরআন অবতীর্ণ করা হয়েছে, যাহা মানুষকে পথ দেখায়, পথের বিস্তৃত বিবরণ দেয় এবং বৈশিষ্ট্য জ্ঞাপন করে।" অন্য কথায়, রমজান ইসলামী শরীয়তের জন্ম মাস। এই কারণে এই মাসকে ইসলামী সাধনায় বিশেষ তৎপরতার জন্য নির্দ্দিষ্ট করা হোয়েছে।

এই বিশেষ চেষ্টার বিশেষ ফল কি হবে? সব ক্ষেত্রেই এ সাধনা ফলদায়ক হবে কি? ইঙ্গিতে আল্লাহ এর উত্তর বলে দিয়েছেন,—আমার দাসগণকে বল, "আমি নিকটে; আমি প্রার্থনাকারীর ডাকে সাঁড়া দেই তারা যখন আমাকেই ডাকে। তারা আমার ডাকে সাঁড়া দিক এবং আমার প্রতি আস্থা রাখুক, তবেই তাদেরকে পথ দেখান হবে"।

সোজা কথায় এ উত্তরের তাৎপর্য্য এই যে রোজার ফলে ঐশীবাণী লাভের যোগ্যতা বৃদ্ধি হয়; হজরত মসীহে মওউদের ভাষায় "কাশফী কুয়াত বাড়ে।"

আল্লার হুজুরে প্রার্থনা কোরে উত্তর পাওয়া তাঁর অস্তিত্ব সম্বন্ধে স্থিরনিশ্চিত হওয়ার শ্রেষ্ঠতম উপায়। যারা বহুল পরিমাণে ঐশীবাণী পান, নাস্তিকতা বা সন্দেহবাদ তাদের নিকটে আসতে পারে না। প্রার্থনার উত্তর পাওয়ার জন্য উদ্ধৃত আয়াতে তিনটি শর্ত্ত দেওয়া হয়েছে—(১) ডাকতে হবে আল্লাকে, কোন কল্পিত সত্বাকে নয়; দেব দেবী, মহামানব, খেয়াল বা খেয়ালী সত্বাকে নয়; (২) আল্লার বিধান বুঝতে ও পালন করতে হবে; এবং (৩) মাঝ পথে হাল ছেড়ে দিলে চলবে না; আল্লার বিধানে অটল আস্থা রেখে অধ্যবসায়ের সাথে সাধনা করে যেতে হবে। লোকে সুস্পষ্ট ঐশীবাণী পায় না এই তিনটি শর্ত্তের কোন না কোনটা পূরণ না করার কারণে। ঐশীবাণীর দ্বার রুদ্ধ হয়েছে মনে করা ভুল।

(৬)

রসুলুল্লার সময় হইতেই, ধর্ম্মনিষ্ঠ মুসলমানগণ রমজান মাসে, বিশেষতঃ এর শেষ দশ দিন, আল্লাকে খুব বেশী স্মরণ করে এবং তার নিকটে প্রার্থনা-রত থাকে। যে সব পরিপুষ্ট ঈমানদার ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব, সংসারের সাথে সব সম্পর্ক ছিন্ন কোরে রমজানের শেষ দশ দিন তারা মসজিদেই পড়ে থাকেন এবং আল্লাহ ভিন্ন আর কারো সাথে কথা বলেন না। ইসলামের পরিভাষায় এই সাধনাকে বলা হয় 'এতেকাফ'।

ইসলামে রমজানের শেষ দশ রাতের মধ্যে একটি রাতকে বৈশিষ্ট্য দেওয়া হয়েছে। হাদীসে এই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ রাতকে 'লায়লাতুল-কদর' বা 'মহা-শক্তিনিশা' বলা হয়েছে। কোরআন করীমেও সুরা 'কদরে' 'লায়লাতুল-কদরের' উল্লেখ করা হোয়েছে। তবে সুরা কদরের 'লায়লাতুল-কদর' এবং হাদীসে বর্ণিত 'লায়লাতুল-কদর' এক ও অভিন্ন কিনা তা নিয়ে সন্দেহের অবকাশ রয়েছে। সুরা কদরে 'লায়লাতুল কদর'কে হাজার মাসের চেয়ে ভাল বলা হয়েছে। হাজার মাসে ৮৩ বৎসর ৪ মাস, যার মধ্যে অন্তত ৮৩টি রমজান থাকে। অন্য কথায়, রমজানের লায়লাতুল-কদর আসে প্রতি বৎসরেই একবার এবং সুরা কদরে বর্ণিত লায়লাতুল কদর আসে শতাব্দীতে একবার। তবে এই দুই লায়লাতুল কদরের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য এই হোতে পারে যে এই রাত প্রতি বৎসর আসলেও প্রত্যেক শতাব্দীতে একবার আসে বিরাট মহিমার সাথে। সুরা কদরে এই বিরাট মহিমাময় শতবার্ষিক লায়লাতুল-কদরের কথা বলা হয়েছে।

(৭)

সুরা বকরে রোজা সংক্রান্ত আয়াতগুলির আগে পরে কি বলা হয়েছে? সমগ্র সুরাটির সংক্ষিপ্ত সার সামনে না রাখলে এ প্রশ্নের উত্তর ঠিক বুঝান যাবে না। এ ক্ষুদ্র প্রবন্ধে তা সম্ভব নয়। রোজা সংক্রান্ত আয়াতগুলির অব্যবহিত আগে পরে যা বলা হয়েছে শুধু তাহাই উল্লেখ করব।

রোজার আয়াতগুলির অব্যবহিত পূর্ব্বে হালাল হারাম খাদ্যের নির্দ্দেশ দেওয়া হয়েছে; প্রকৃত পুণ্য কি তা বলা হয়েছে; অনাথ, আর্থিক অচল ও পথিকদের খেদমত করতে বলা হয়েছে; এবং দেশের ধন জন রক্ষার জন্য তৎপর থাকিতে বলা হয়েছে। রোজার আয়াতের শেষে একে অন্যের সম্পদ গ্রাস করতে নিষেধ করা হয়েছে। এই সব আদেশ পালনের জন্য আবশ্যক আত্মিক শক্তি অর্জনই যে রোজার উদ্দেশ্য তাহাতে কোনরূপ সন্দেহ নাই।

যারা কোরআনের আয়াতগুলির 'শানে নজুল' অন্বেষণে ব্যস্ত থাকেন, তাঁরা হয় ত আগে পরের আয়াতগুলির সম্বন্ধ নির্ণয়ের প্রচেষ্টাকে গুরুত্ব দেবেন না। তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, রসুলুল্লার প্রতি অবতীর্ণ ওয়াহীগুলি অবতরণের ক্রম অনুসারে কোরআনে স্থান পায় নাই; বর্ণিত বিষয়ের ক্রম অনুসারেই স্থান পেয়েছে এবং স্বয়ং রসুলুল্লার নির্দ্দেশ অনুসারেই এইরূপ করা হয়েছিল। বর্ণিত বিষয়ের ক্রম অবতরণের ক্রম হইতে বেশী গুরুত্বপূর্ণ না হোলে নিশ্চয়ই এরূপ করা হোতো না।

কোরআন হইতে কিঞ্চিৎ

রমজান সম্বন্ধে

(সুরা বকর, ২৩ রুকু, ১৮৩—৮৭ আয়াত)

হে মুমিনগণ, তোমাদের উপর রোযা ফরজ করা হইল, যেভাবে তোমাদের পূর্ব্ববর্ত্তীগণের উপর ফরয করা হইয়াছিল, যেন তোমরা 'মুত্তাকী' হইতে পার। (রোযা রাখিবে) গণিত কয়েক দিন, তবে তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি পীড়িত বা প্রবাসী থাকে, সে অন্য সময়ে সমসংখ্যক রোযা রাখিবে, এবং যাহারা সক্ষম, তাহারা রোযার বিনিময়ে দরিদ্রকে আহার দিবে। তবে আগ্রহের সহিত যে ব্যক্তি পুণ্য কার্য্য করিবে, তাহার জন্য উহাই শ্রেয়ঃ; এবং তোমাদের জন্য রোযা রাখাই মঙ্গলজনক, যদি তোমরা বুঝিয়া দেখ।

রমজান মাসেই কুরআন অবতীর্ণ হইয়াছিল; মানব জাতির জন্য ইহা পথ প্রদর্শক এবং পথ স্পষ্টকারক এবং বৈশিষ্ট্যদায়ক। অতএব তোমাদের যে কেহ এই মাস দেখে, সে রোযা রাখিবে। তবে (এই মাসে) যে কেহ পীড়িত থাকে বা প্রবাসে থাকে, সে অন্য সময়ে সমসংখ্যক রোযা রাখিবে। আল্লাহ চান তোমাদের জন্য যা সহজ, যা কঠিন তা চান না, যেন তোমরা গণিত দিনগুলি পূর্ণ করিতে পার, এবং তোমাদিগকে পথ দেখানোর জন্য যেন তোমরা আল্লাকে বড় বলিতে পার এবং কৃতজ্ঞ হও।

এবং (হে মুহাম্মদ), যখন আমার দাসগণ তোমাকে জিজ্ঞাসা করে আমার সম্বন্ধে, (তুমি তাহাদিগকে বলিও) আমি নিকটে; আমি প্রার্থনাকারীর প্রার্থনার উত্তর দেই যখন সে আমাকে ডাকে। অতএব তাহারা আমার আহ্বানে সাঁড়া দিক এবং আমার প্রতি আস্থা রাখুক, তবেই তাহারা পথ পাইবে।

রোজার রাত্রে স্ত্রীগমণ তোমাদের জন্য বৈধ করা গেল। তাহারা তোমাদের বসন এবং তোমরা তাহাদের বসন। আল্লাহ অবগত আছেন যে তোমরা আত্মবঞ্চনা করিতেছ। তাই তিনি তোমাদের প্রতি সদয় হয়েছেন এবং তোমাদের ভার লঘু করেছেন। অতএব এখন হইতে তোমরা স্ত্রীসহবাস কর এবং আল্লাহ তোমাদের জন্য যাহা বিধিসম্মত করেছেন, তাহা আহরণ কর; এবং তোমরা পানাহার কর অন্ধকার-রেখা হইতে উষার আলোক-রেখা স্পষ্ট হওয়া পর্য্যন্ত। অতঃপর রাত্রি আসা পর্য্যন্ত রোজা পূর্ণ কর। তবে মসজিদে 'এ'তেকাফ' করার অবস্থায় স্ত্রীসহবাস করিও না। এইগুলি আল্লার নির্দ্দিষ্ট সীমারেখা। অতএব এগুলির নিকটে যাইবে না। মানব জাতির মঙ্গলের জন্য এইভাবে আল্লাহ তাঁহার বিধানমালা স্পষ্ট করিয়াছেন, যেন তাহারা 'মুত্তাকী' হইতে পারে।

হাদীস-সংগ্রহ

ইসলামে মা'য়ের স্থান

(Reveiw of Relegions. J nuary, 1955 হইতে সংগ্রহ)

[অনুবাদক—মোহাম্মদ নূরউল আলম]

১। মিকদাম-বিন মা-আদ ইয়াকরব হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে তিনি হজরতকে বলিতে শুনিয়াছেন 'হে মানবগণ, মায়ের প্রতি সদয় ব্যবহার করিতে আল্লাহতায়ালা তোমাদিগকে বাধ্য করিয়াছেন। তোমরা আবার আমার কথা শুন যে আল্লাহ তোমাদিগকে মায়ের প্রতি সদয় ব্যবহার করিতে বাধ্য করিয়াছেন। অতঃপর তোমাদিগকে পিতার প্রতি সদয় ব্যবহার করিতে বাধ্য করিয়াছেন এবং ক্রমে ক্রমে আত্মীয় স্বজন ও অন্যান্যদিগের তোমরা সদয় ব্যবহার করিতে আদিষ্ট হইয়াছ। (বোখারী)

২। আবু হোরাইররা হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে কোন এক ব্যক্তি হজরত মোহাম্মদ (দঃ)এর সমীপবর্ত্তী হইয়া কহিল, হে আল্লাহর রসুল কে অধিকতর ভাল ও সদয় ব্যবহারের উপযুক্ত ? হজরত বলিলেন, 'তোমার মা।' তিনি আবার বলিলেন 'তারপর কে ?' 'তোমার মা' উত্তর আসিল। তিনি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন 'তারপর কে ?' হজরত উত্তর করিলেন 'তোমার মা' তারপরেও আবার কহিলেন, 'তারপর কে ?' 'তোমার পিতা' হজরত বলিলেন। (বোখারী)

৩। আনাস হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, মা'য়ের পায়ের তলায় বেহেস্ত। (কন্‌জুল উম্মাল)

৪। হজরত আবুবকরের কন্যা আস্‌মা হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হজরতের জীবদ্দশায় একদা তাহার মা (আস্‌মার মা) তাহাকে দেখিতে আসিয়াছিল কিন্তু তখনো আস্‌মার মা পৌত্তলিক ছিলেন। তাই বলিয়া আস্‌মা হজরতকে জিজ্ঞাসা করিল 'আমার মা যখন স্নেহের আধিক্যে আমাকে দেখিতে আসিয়াছেন আমার কি তাহার প্রতি সদয় ব্যবহার করা উচিত ? মহানবী উত্তর করিলেন 'হা, (নিশ্চয়ই)।

৫। আবু তোফায়েল হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, জর-আনাতে হজরতকে মাংস বিতরণ করিতে দেখিয়াছিলাম। তখন আমি যুবক ছিলাম এবং যখন আমি উটের মাংস বহন করিয়া লইয়া যাইতেছিলাম তখন একজন স্ত্রীলোক আসিয়াছিল। তৎক্ষণাৎ হজরত তাহাকে বসিবার জন্য নিজের কাপড় জমিনে পাতিয়া দিলেন। এই স্ত্রীলোকটি কে যাহার প্রতি হজরত এত সদয় হইতে পারেন ? জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম তিনি হজরতের ধাত্রী মাতা। (বোখারী)

৬। আয়েশা হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, এক ব্যক্তি মহানবীর নিকট আসিয়া কহিল, আমার মা আকস্মিকভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। আমার মনে হয় যদি তার বলিবার মত শক্তি থাকিত তাহা হইলে তিনি আমাকে কিছু দান করিবার জন্য উপদেশ দিতেন। যদি আমি এখন কিছু খয়রাত করি তবে কি উহা তাহার উপকারে লাগিবে ? মহা নবী উত্তর করিলেন, হা, (নিশ্চয়ই)। (বোখারী)

আদম সন্তানের আজাদী

—মোহম্মদ মোস্তাফা আলী

মানুষকে কেন্দ্র করেই বিরাট বিশ্বের সৃষ্টি। প্রকৃতির মাঝে তার এ উচ্চাসনের পেছনে রয়েছে চিন্তাশক্তি ও বুদ্ধির বিকাশ। ইহাদের বলে সে প্রকৃতির সবকিছুর মধ্যেই অর্থ খুঁজে বেড়ায়। অর্থ খুঁজে খুঁজে সে প্রকৃতির নব নব রহস্যকে উদ্‌ঘাটিত করে চলেছে। অজানাকে জানতে গিয়ে, অচেনাকে চিনতে গিয়ে সে তার নিজের মাঝেও নতুন নতুন শক্তি ও সত্যের সন্ধান পাচ্ছে। কিন্তু মানুষের চিন্তাশক্তি, বুদ্ধি, বিবেচনা ও অন্যান্য শক্তি সমূহকে প্রয়োজনীয় নিয়ন্ত্রণাধীনে রাখতে না পারলে সে কেন্দ্রচ্যুত হয়ে অবনতির দিকে চলতে থাকে। ইহাও প্রকৃতিরই বিধান।

বিচ্ছিন্ন জংলী জীবন হ'তে যাত্রা তার শুরু হয়; আর আজ সে বিশ্বময় এক মহাজাতি গড়ে তোলার স্বপ্নকে রূপায়িত করতে গিয়ে তার মনের কোণে এক বিরাট জিজ্ঞাসা জেগে উঠেছে; যতই সে এগিয়ে চলেছে তাতে কি তার আজাদী ক্ষুন্ন হচ্ছে, না, ইহা বিস্তৃতি লাভ করছে ?

এ প্রশ্নের মীমাংসায় পৌছতে হলে দেখতে হবে জন্ম হতে মৃত্যু পর্য্যন্ত প্রকৃতি মানুষকে কোথায় কিভাবে কতটুকু আজাদী দান করেছে বা তা হরণ করে নিয়েছে।

জন্মের মধ্যে কারো কোন অধিকার আছে বলে ত মনে হয় না। যদি তাই হতো তবে কবিকে 'নবরত্নের' কালে দশম রত্ন হওয়ার জন্য বলতে হতোনা—"জন্ম যদি নিতেম আমি কালিদাসের কালে।" জন্ম নেওয়ার স্বাধীনতা থাকলে সমস্যাও কম হতো না। অনেক স্বাস্থ্যবান দম্পতিকেও হয়ত শত সাধ্য-সাধনা করেও 'আটকোরাই' থাকতে হতো; আবার বহু পিতা মাতা হয়ত শত শত সন্তানের ভিড়ে অতিষ্ঠ হয়ে এই স্বাধীনতার বিরুদ্ধে স্রষ্টার দরবারে অভিযোগ পেশ করতো। জন্মের ভিতর দিয়ে যেন এক ইচ্ছাময়ের ইচ্ছারই বিকাশ হচ্ছে—আমরা সেখানে পুতুল মাত্র। জন্মের স্বাধীনতা না থাকার ভিতরে আদম সন্তানের জন্য অনেক মহান শিক্ষার ইংগিত রয়েছে।

স্বাধীনতা নেই বলেই জন্মের জন্য কাকেও উচ্চ বা নীচ বলে গণ্য করা যেতে পারে না। যে কাজে যার স্বাধীনতা নেই সে কাজের জন্য সে কখনও দায়ী হতে পারে না। এই পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে সাদা-কালো, ব্রাহ্মণ-শূদ্র, সৈয়দ-পাঠান ইত্যাদি বহু প্রশ্নের ভিত্তিমূলে জোর আঘাত পড়বে। জাতীয় জীবনকে এসকল কলুষ হতে মুক্ত করতে হলে, বিশ্ব মানবের এক মহাজাতি গড়ে তোলার স্বপ্নকে সার্থক করে তুলতে হলে—জন্মের দরুণ মানুষে মানুষের অযথা ভেদাভেদ করার মনোভাবকে সমূলে ধ্বংস করতে হবে।

জন্মের পরে আসে পরিবেশের কথা। যে পরিবেশে শিশুর জন্ম হয় তা দ্বারা তার জীবনের গতি বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হয়ে থাকে। কিন্তু পরিবেশের উপর তখন তার কোন হাত থাকে না। অন্যান্য জীবজন্তুর চেয়ে মানুষের বেলায় পরিবেশের প্রভাব অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। এ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা এখন সম্ভব নয়। যা হউক আমরা যদি ব্যষ্টি বা সমষ্টিকে পরিবেশের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করতে অভ্যস্ত হই তবে দুনয়া হতে সহজেই বহু ভুল বুঝাবুঝি দূর হয়ে যাবে এবং পরস্পরের মধ্যে সহানুভূতি ও সহযোগিতা অনেকাংশে বৃদ্ধি পাবে। মানুষ তার বুদ্ধি বিবেচনা ও চেষ্টা চরিত্রের দ্বারা নতুন পরিবেশ সৃষ্টিও করতে পারে—এবং অহরহ সে তা করে যাচ্ছে—একথাটাও সর্ব্বদা স্মরণ রাখা উচিত। এখানে তার বেশ অনেকটা স্বাধীনতা রয়েছে।

মনুষত্ব অর্জ্জনে আদম সন্তানের যে চেষ্টার স্বাধীনতা রয়েছে—অন্য কোন জীব জন্তুর বেলায় তা বড় একটা পরিলক্ষিত হয় না। পশুকে পশুত্ব অর্জ্জনের জন্য বিশেষ কোন চেষ্টা চরিত্র করতে হয় না; পক্ষী তার পক্ষীত্ব আপছেই পেয়ে থাকে। কিন্তু মানুষকে বহু সাধ্যসাধনার ভিতর দিয়ে মনুষত্ব' অর্জ্জন করতে হয়। তবে পশু তার পশুত্বকে কখনও বর্জ্জন করতে পারে না। কিন্তু মানুষ তার মনুষত্বকে বর্জ্জন করে পশুত্বের অধিকারীও হতে পারে; এর চেয়ে নিম্নস্তরেও যেতে পারে। এখানে তার বেশ স্বাধীনতা রয়েছে। অনেকে প্রকৃতির দেওয়া এই চেষ্টার স্বাধীনতার (তদবিরের) কথা ভুলে গিয়ে সব কিছু নিয়তির (তকদিরের) উপর ছেড়ে দেয়। কিন্তু একটু গভীরভাবে চিন্তা করলেই দেখা যাবে, এরূপ মনোভাব দ্বারা তারা পশু পক্ষীর জগতে গিয়েই ভর্ত্তি হতে চায়। প্রকৃতি মানুষের মধ্যে তদবির ও তকদিরের একটা সুষ্ঠু সমন্বয় ঘটিয়েছে। এ সমন্বয়ের কথা ভুলে গেলেই সীমা লঙ্ঘন করা হবে এবং ভুলে যাওয়ার মাশুলও দিতে হবে।

প্রকৃতির তাগিদেই মানুষ সামাজিক। প্রকৃতিগত মালমশল্লা দ্বারা তাকে সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হয়। সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলার ভিত্তি-প্রস্তর হলো পারিবারিক জীবন। পারিবারিক জীবনের সূচনাও হয় বিবাহের ভিতর দিয়েই। এই জন্যই হয়তো দাম্পত্য সম্পর্ক দিয়েই আল্লাহতালা বাবা আদম ও মা হাওয়াকে বেহেশত হতে মরজগতে পাঠিয়েছিলেন। যা'ক সে কথা। পারিবারিক ও সামাজিক জীবন গড়ে তুলতে গিয়ে আদম সন্তানের পূর্ণ স্বরাজে অনেকখানি বাধা আছে। সুষ্ঠু সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে যে সকল বাধা বা বাধনের প্রয়োজন হয় তা মেনে না নিলে সামাজিক জীবন ছিন্ন করতে হবে। তা করতে গেলে পরস্পরের উপর একান্ত নির্ভরশীল মানুষের জীবন ধারণই অসম্ভব হয়ে উঠবে। বেঁচে থাকার তাগিদেই আজাদীকে অনেকখানি সংকুচিত করে সমাজ বন্ধনের শৃঙ্খলকে স্বীকার করতে হচ্ছে।

কতকগুলি উদাহরণ নিয়ে উপরোক্ত কথাগুলো আলোচনা করার চেষ্টা করা যাক। প্রত্যেক দেশেই শাসন ও সামগ্রিক উন্নতির জন্য সরকার প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। কিন্তু সে সরকার ব্যষ্টির স্বাধীন ইচ্ছার দ্বারা

পরিচালিত হয় না। আর তা করতে গেলে স্বাধীনতার নামে দেশে উচ্ছৃংখলাই চালু হবে। ফলে দেশের সামগ্রিক উন্নতি না হয়ে বরং অবনতিই হবে। বস্তুতঃ ব্যষ্টি ও সমষ্টির মংগলের জন্য স্বাধীনতাকে যতটুকু সংকুচিত করা হয় তা দেশের অগ্রগতির পথই সহজ ও সুগম করে।

সৈন্যরা যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দেয়। কিন্তু কার বিরুদ্ধে কখন যুদ্ধ করতে হবে সে স্বাধীনতা তাদের মোটেও নেই এবং থাকা উচিতও নয়। (They are not to reason why, they are but to do and die) এমন কি সামান্য সভাসমিতি করতে গেলেও সবাইর সব ইচ্ছাকে মেনে চলা সম্ভব হয় না। চিকিৎসা করতে গিয়ে রোগীকে ডাক্তারের ইচ্ছার নিকট ছেড়ে দিতে হয়। যদি তা না করে কোন রোগী স্বাধীনতা বজায় রাখতে চায় তবে ডাক্তার তাকে নাজাত দিলেও পরিণতি তাকে ছাড়বে না। পারিবারিক জীবনের কথা পূর্ব্বেই বলেছি। দাম্পত্য জীবনে স্বামী-স্ত্রী উভয়েই যদি নিরংকুশ আজাদী ভোগ করতে অটল অচল হয়ে দাঁড়ায়, তবে এ স্বাধীনতা তাদেরকে অমংগলের দিকেই টেনে নিবে। তারপর আসে শিশুদের কথা। তাদের দ্বারা মা বাপের স্বাধীনতা কতো ভাবে ক্ষুণ্ণ হয় এ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার কোন প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। অনুরূপ আজাদীর সঙ্কোচনকে ত্যাগ বলে অভিহিত করা যেতে পারে। মা-বাপ যদি এ সকল ত্যাগের জন্য প্রস্তুত না হতো, তবে দুনয়া হতে আদম সন্তানের অস্তিত্বই হয়ত বিলীন হয়ে যেতো। শিশুদের মর্জি মেজাজ রক্ষা করার জন্য প্রত্যেক মা-বাপই যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। তাই বলে সব সময়েই তাদের মর্জি মেজাজকে রক্ষা করা হয় না। তাদেরকে অবাধ স্বাধীনতা দিলে অনেক ক্ষেত্রেই সমূহ অমংগলের কারণ হবে। মংগলের জন্যই তাদের স্বাধীনতায় হাত দিতে হয়। কাম, ক্রোধ, লোভ ইত্যাদি প্রবৃত্তির তাগিদেই জীবজন্তু সব কিছু করে থাকে। কিন্তু মানুষের বেলায় ওগুলির সাথে তার উন্নত বুদ্ধি বিবেচনার সংযোগ ঘটেছে। ফলে তার প্রবৃত্তির স্বাধীনতা বহুল পরিমাণে সংকুচিত হয়েছে। প্রবৃত্তিগুলো যেন তার শক্তি (Power) আর বুদ্ধি বিবেচনা যেন তার চালক (Driver) আর ব্যষ্টি ও সমষ্টির মংগল কামনা হলো তার লাগাম (brakes)। তাই বলতে হয় যেদিন থেকে জীবন পথে মানুষ নিল যুক্তির আশ্রয় সেদিন থেকেই সে হারালো তার স্বাধীনতা। পশুপক্ষীর ন্যায় যেখানে সেখানে সে প্রস্রাব পায়খানা ইত্যাদি করতে পারে না। যখন সে কিছু করতে যায় তখন সে শুধু প্রবৃত্তির তাড়নায় পরিচালিত হতে পারে না। তাকে সবকিছু যুক্তির কষ্টি পাথরে বিচার করতে হয়, প্রত্যেক কাজের ভূত-ভবিষ্যৎ যাচাই করে দেখতে হয়। সর্ব্বোপরি কর্ম্মফলের দায়িত্বভার নিবার জন্য প্রস্তুত থাকতে হয়। এই দায়ীত্বশীলতাও তার উন্নততর জীবনের জন্য অনেকখানি দায়ী।

তবে গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখা যাবে, যুক্তির নিকট (rationality) স্বাধীনতা বিকায়ে আদম সন্তানকে পশু তাতে হয়নি; বরং ইহা তার জীবনকে উন্নত, সুন্দর ও গৌরবময় করেছে। অন্যান্য জীবজন্তু হয়ত মানুষের চেয়ে অধিকতর আজাদী ভোগ করে থাকে। কারণ ওরা চলে—'যখন এ মন যেদিকে চায়'। কিন্তু তারা ক্রমোন্নতির স্বাদ হতে বঞ্চিত হয়েছে। বরং তাদের যা কিছু উন্নতি হচ্ছে সেটাও অনেকটা মানবীয় চেষ্টারই ফল।

বিজ্ঞানের প্রসারের সাথে সাথে বাহ্যিক বাধা বিপত্তি ধীরে ধীরে সব দূর হয়ে যাচ্ছে। ফলে দুনয়াতে এক মহামিলনের বাঁশি বেজে উঠেছে। কিন্তু মনোজগতের বাধা বিপত্তি কাটায়ে উঠতে না পারলে—এ মিলন হয়ত মর্ম্মান্তিক বিরহই বহন করে আনবে। এ মিলনকে সার্থক করে তুলতে হলে চিন্তার স্বাধীনতার সাথে সাথে মুক্ত বুদ্ধির স্বাধীনতা স্বীকার করা ছাড়া আর কোন সহজ পথ আছে বলে ত মনে হয় না।

সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত জাতি আমরা, তাই অনেকের মনে আজাদী সম্বন্ধে সঠিক ধারণা জন্মে নি। তারা প্রশ্ন করে থাকে—মন যা চায় তাই যদি না করতে পারলুম তবে এ আবার কোন স্বাধীনতা—এ নিয়ে এত ঢাক-ঢোল কেন? প্রকৃত পক্ষে স্বাধীনতার অর্থ হলো বুদ্ধি, সদিচ্ছা ও শক্তি দ্বারা দেশকে গড়ে তোলার অধিকার লাভ! যদি তা না করে আমরা আমাদের অন্তর্নিহিত পশুশক্তির নিকট হার মানি, প্রবৃত্তির উত্তাল তরঙ্গে ভেসে বেড়াই, বা অন্ধ গোঁড়ামির নিকট আত্মবিক্রয় করে তদবির ও তকদিরের সীমা রেখা ও সমন্বয়কে অস্বীকার করি, তবে এ স্বাধীনতা শুধু ব্যর্থতাই ডেকে আনবে না বরং দেশে পশু-রাজত্বই কায়েম করবে। তাই আমাদের প্রবৃত্তিসমূহকে সদিচ্ছা, বিবেকবুদ্ধি ও জ্ঞান বিজ্ঞানের সাহায্যে উচ্ছৃংখলতা ও জড়তার হাত হতে রক্ষা করতে হবে। তা করতে পারলেই এ দুনয়ায় 'পূলছেরাত' পাড়ি দেওয়া সহজ হবে।

জীবনের যে শেষ ক্রিয়া পরপারে যাত্রা, তাতেও ত আদম সন্তানের কোন আজাদী নেই। কখন কোথায় কিভাবে ইচ্ছাময়ের ডাক পড়বে তাতে কারো কোন হাত নেই। তাই মনে হয়—তাঁর ইচ্ছার সাথে আমাদের ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষার মিলন হলেই আজাদী পূর্ণতা লাভ করে সার্থক হয়ে উঠে। এপথে প্রকৃতির মাঝে তার স্থান অক্ষুণ্ণ থাকবে এবং বিশ্ব-মানবতা গড়ে উঠার পথ সহজ ও সুগম হয়ে উঠবে। মনে রাখতে হবে সৃষ্টির কেন্দ্র স্থানচ্যুত হলে সারা সৃষ্টিতেই অযথা বিপ্লব সৃষ্টি হবে।

[আজাদ—১।৫।৫৫]

ইসলামী রাষ্ট্র

ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করা হবে, আমাদের রাজনৈতিক নেতাদের এই প্রতিশ্রুতি পেয়ে অখণ্ড ভারতের শতকরা অন্ততঃ নব্বই জন মুসলমান পাকিস্তান আন্দোলনে ঝাপাইয়া পড়েছিল। ইসলামী রাষ্ট্র বলতে কি বুঝায়? এ প্রশ্ন নিয়ে তখন কোন আলোচনা হয় নাই। প্রত্যেকেই নিজ নিজ সোনালী স্বপ্নে বিভোর ছিল এবং ধরে নিয়েছিল যে এ বিষয়ে মুসলমান মাত্রই একমত। এখন অনেকেই অনুযোগ করেন, আমাদের বর্ত্তমান রাষ্ট্রনেতাগণ তখনকার সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে ইচ্ছুক নন।

যারা এই অনুযোগ করেন, তাদের মধ্যেও এমন বহু লোক আছেন, যাদের জীবন প্রণালীর সাথে ইসলামের জীবন প্রণালীর অবিসংবাদী অংশগুলিরও মিল খুজে পাওয়া যায় না। সত্য সত্যই যারা ইসলামী রাষ্ট্র চান, তাদেরকে প্রথমেই ইসলামের সেই সব অনুশাসন মেনে চলতে হবে যেগুলি মেনে চলতে কেউ বাধা দেয় না; এবং তারপর যেগুলি মানতে গেলে কেহ বাধা সৃষ্টি করে, সেগুলি কায়েম করবার পথ বের করতে হবে।

ইচ্ছা করলেই ইসলামের যে সব বিধান পালন করা যায়, তা যারা অবহেলা করে তাদের এই শ্রেণীর অনুযোগকে তাদের প্রতিপক্ষগণ রাজনৈতিক ক্ষমতা হাসেল করবার একটা দুরভিসন্ধি ছাড়া আর কি মনে করতে পারে? বস্তুতঃ অনুযোগকারী-দের আন্তরিকতা সম্বন্ধে সন্দেহ করবার যথেষ্ট কারণ আছে বলিয়াই তাদের কথার কেহই কোন মূল্য দিতে চায় না।

যে সব রাষ্ট্রনেতার বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয় যে তারা ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করতে চেষ্টা করছেন না, স্মরণ রাখতে হবে যে তাঁরা কেহই অমুসলমান নহেন এবং তাদের কেহই এ কথা বলেন না যে ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করা হবে না। জিজ্ঞাস্য শুধু এই যে তারা বিলম্ব করছেন কেন?

বিলম্বের কারণ দুইটি হতে পারে; (১) সন্দেহ করা যেতে পারে যে আমাদের ক্ষমতাসীন রাষ্ট্র নেতাগণ লোকদের খুসী করবার জন্য ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করবার কথা বলেন বটে, কিন্তু অন্তরের সাথে তারা ইসলামী রাষ্ট্রকে শুভ মনে করেন না। দ্বিতীয়তঃ, এ কথাও মনে করা যেতে পারে যে ইসলামী রাষ্ট্র বলতে ওলামায়ে কেরাম যা বুঝান, আমাদের রাষ্ট্র নেতাগণ বর্ত্তমান যুগের পরিপ্রেক্ষিতে তার মধ্যে এমন সব পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন আবশ্যক মনে করেন যাহা সত্য সত্যই সময়সাপেক্ষ।

এই দুই কারণের প্রথমটি স্বীকার করতে অন্তরাত্মা শিহরিয়া উঠে। যারা আজন্ম মুসলমান, পাশ্চাত্য শিক্ষার ফলে বা অন্য কোন কারণে তাহারাই যদি ইসলামী রাষ্ট্রকে অশুভ মনে করেন, যারা মুসলমান নন তারা ত এরূপ রাষ্ট্র কায়েম করলেও দু দিনেই তা ভেঙ্গে চুরমার করতে উদ্যত হবে। তারা কিছুই করতে পারবে না মনে করলে ইতিহাস অস্বীকার করা হবে। অতীতে তারা বহু মুসলিম রাষ্ট্র ধ্বংস করেছে; এখন পারবে না মনে করবার সপক্ষে যুক্তি কি আছে? অতীতের তুলনায় এখন ত অমুসলমানদের কাছে মুসলমানদের পরাস্ত হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী।

দ্বিতীয় কারণটাই আসল কারণ বলে মনে হয়, যার জন্য ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করতে বিলম্ব হচ্ছে।

বয়ানুল-কুরআন—পবিত্র কুরআনের সরল বঙ্গানুবাদ

ছুরা আ-লে ইমরাণ

—মুমতায আহমদ
মুবাল্লিগ, সদর আঞ্জুমনে আহমদীয়া

১১ রুকু ৮ আয়াত ১০২—১০৯

১০২। হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর যতটা তাঁহাকে ভয় করা উচিত; এবং (তাঁহার নিকট) আত্মসমর্পণকারীরূপে ব্যতীত যেন তোমাদের মৃত্যু না হয়।

১০৩। এবং তোমরা সকলে দৃঢ়ভাবে আল্লার রজ্জু ধারণ কর এবং দলে দলে বিভক্ত হইও না; এবং তোমাদের প্রতি আল্লার অনুগ্রহ স্মরণ কর;—তোমরা পরস্পর শত্রু ছিলে, তিনি প্রীতির বন্ধনে তোমাদের হৃদয় আবদ্ধ করিলেন এবং তাঁহার অনুগ্রহে তোমরা ভাই ভাই হইয়া গেলে; এবং তোমরা অনলকুণ্ডের পার্শ্বে ছিলে, সেখান হইতে তিনি তোমাদিগকে উদ্ধার করিলেন। তোমাদের মঙ্গলের জন্য এইভাবে আল্লাহ তাঁহার নিদর্শনগুলি স্পষ্ট করেছেন, যেন তোমরা সুপথগামী হও।

১০৪। তোমাদের মধ্যে এমন সঙ্ঘ থাকা চাই যাহারা মঙ্গলের দিকে আহ্বান করিবে; সৎকাজ করিতে আদেশ দিবে, এবং অসৎ কাজ করিতে বারণ করিবে, এবং তাহারাই সফলতা লাভ করিবে।

১০৫। এবং তোমরা তাহাদের মত হইও না যাহারা নানা দলে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে এবং প্রকাশ্য নিদর্শনরাজী সমাগত হওয়ার পর মত বিরোধ করিয়াছে; এবং বিরাট শাস্তি নির্দ্ধারিত রহিয়াছে তাহাদের জন্য।

১০৬। সেই দিন অনেকের বদন মণ্ডল উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে এবং অনেকের কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করিবে। যাহাদের বদন মণ্ডল কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করিবে (তাহাদিগকে বলা হইবে), ঈমান আনয়ণের পর তোমরা কাফির হইয়া গিয়াছিলে? অতএব তোমাদের কুফর গ্রহণ করার ফলে শাস্তির স্বাদ গ্রহণ কর।

১০৭। এবং যাহাদের বদন মণ্ডল সমুজ্জল থাকিবে তাহারা আল্লার মঙ্গল আশীষে অবস্থান করিবে; তাহারা চিরকাল তথায় বাস করিবে।

১০৮। এইগুলি আল্লার বিধান। তোমার নিকট আমরা উহা সঠিক-ভাবে বর্ণনা করিতেছি; যেহেতু বিশ্ববাসীর উপর অত্যাচার করা আল্লার অভিপ্রেত নহে।

১০৯। এবং আকাশসমূহে এবং পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে, সমস্তেরই মালিক আল্লাহ এবং আল্লারই দিকে সব কিছু প্রত্যাবর্ত্তিত হইবে।

১২ রুকু ১১ আয়াত ১১০—১২০

১১০। তোমরা উৎকৃষ্টতম মণ্ডলী; মানব জাতির কল্যাণের জন্য উদ্ভূত হইয়াছ; (জনগণকে) তোমরা সৎকাজের আদেশ দিতেছ এবং অসৎকাজ বারণ করিতেছ এবং তোমরা আল্লার উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছ। এবং গ্রন্থধারিগণ যদি ঈমান আনয়ন করিত, তাহাদের জন্য মঙ্গলজনক হইত। তাহাদের কতক লোক মুমিন এবং তাহাদের অধিকাংশই পাপাচারী।

১১১। পীড়া দিবে বৈ তাহারা কখনও তোমাদের কোন অনিষ্ট করিতে পারিবে না। তোমাদের সহিত যদি তাহারা সংগ্রামে লিপ্ত হয়, নিশ্চয়ই তোমাদের নিকট তাহারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিবে। অতঃপর তাহাদিগকে সাহায্য করা হইবে না।

১১২। আল্লার সংরক্ষণ অথবা অপর জাতির সংরক্ষণ ব্যতিরেকে তাহারা যেখানেই অবস্থান করিবে, তাহাদের উপর লাঞ্ছনার মার পড়িবে; এবং আল্লার অভিসম্পাত এবং অবমাননা তাহাদের উপর পুঞ্জীভূত হইয়া আছে। কারণ তাহারা আল্লার বিধান প্রত্যাখ্যান করিত এবং অন্যায় ভাবে নবীগণকে হত্যা করিতে চেষ্টা করিত। ইহার এই কারণ যে তাহারা আল্লার বিধি-নিষেধগুলি অমান্য করিত এবং গণ্ডী অতিক্রম করিয়া যাইত।

১১৩। তাহাদের সকলেই সমান নহে। গ্রন্থধারিগণের মধ্যে ন্যায়নিষ্ঠ সম্প্রদায়ও আছে, রজনীযোগে ছিজদার অবস্থায় যাহারা আল্লার বাক্যাবলী আবৃত্তি করিয়া থাকে।

১১৪। তাহারা আল্লাহ এবং পরকালে বিশ্বাস রাখে এবং সৎকাজ করিতে আদেশ দেয়, অসৎকাজ করিতে বারণ করে, এবং পুণ্য কাজে তৎপর থাকে। তাহারা স্বজ্জনগণের অন্তর্ভূক্ত।

১১৫। এবং তাহারা যে সব পুণ্য কার্য্য করে, উহার পুরস্কার হইতে তাহারা বঞ্চিত হইবে না। এবং ধর্ম্মভীরুগণকে আল্লাহ সম্যক জানেন।

১১৬। (সমাগত নবীকে) যাহারা প্রত্যাখ্যান করিয়াছে, তাহাদের সম্পদ এবং তাহাদের সন্তান সন্ততিগণ তাহাদিগকে আল্লার শাস্তি হইতে রক্ষা করিতে পারিবে না; এবং তাহারা দুঃখের অধিবাসী; তথায় তাহারা দীর্ঘকাল বাস করিবে।

১১৭। এই পার্থিব জীবনের জন্য যাহা ব্যয় করা হয়, তাহা সেই বায়ু প্রবাহবৎ, যাহার মধ্যে জীবননাশক প্রচণ্ড শীত থাকে, যাহা এমন লোকদের শষ্যক্ষেত্রে আঘাত হানে যাহারা তাহাদের আত্মার উপর অত্যাচার করিয়াছে, তৎপর উহাকে বিনষ্ট করে এবং আল্লাহ তাহাদের উপর অত্যাচার করেন না বরং তাহারাই তাহাদের উপর অত্যাচার করে।

১১৮। হে মুমিনগণ! আপন লোকদিগকে ব্যতীত কাহাকেও অন্তরঙ্গ বন্ধু করিও না। তোমাদের অনিষ্ট করিতে তাহারা ত্রুটী করে না। তাহারা তাহাই কামনা করে যাহাতে তোমাদের কষ্ট হয়; বিদ্বেষ তাহাদের কথায় প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে এবং তাহাদের হৃদয়ে যাহা লুক্কায়িত আছে তাহা আরও ঘোরতর। তোমাদের মঙ্গলের জন্য এই নিদর্শনগুলিকে আমরা সুস্পষ্ট ভাবে ব্যক্ত করিলাম যদি তোমরা বুদ্ধি প্রয়োগ কর।

১১৯। দেখ, তোমরাই এমন লোক যাহারা তাহাদিগকে ভালবাসিবে অথচ তাহারা তোমাদিগকে ভালবাসে না, এবং সমগ্র কিতাবের প্রতি তোমরা ঈমান পোষণ কর। তাহারা যখন তোমাদের সহিত সাক্ষাত করে তখন বলে—আমরা বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছি এবং যখন তাহারা নিভৃতে চলিয়া যায়, তখন তোমাদের উপর আক্রোশভরে অঙ্গুলিগুলি দংশন করে। (হে নবী,) তুমি বল, তোমাদের আক্রোশে তোমরা মর। আল্লাহ অবশ্যই অন্তর্যামী।

১২০। তোমাদের মঙ্গল ঘটিলে তাহারা ব্যথিত হয় এবং তোমাদের অমঙ্গল ঘটিলে তাহারা আনন্দিত হয়। এবং যদি তোমরা ধৈর্য্য ধারণ কর এবং তকওয়া গ্রহণ কর, তাহাদের দুরভিসন্ধি তোমাদের কোন অনিষ্ট করিতে পারিবে না। আল্লাহ নিশ্চয় তাহাদের ক্রিয়াকলাপগুলিকে বেষ্টন করিয়া আছেন।

১৩ রুকু ৯ আয়াত ১২১—১২৯

১২১। এবং (সেই কথা স্মরণ কর) উষাকালে নিজ পরিবার হইতে বহির্গত হইয়া মুমিনদিগকে তুমি যখন যুদ্ধের জন্য সন্নিবেষ্টিত করিতেছিলে; এবং আল্লাহ শ্রবনশীল, জ্ঞানময়।

১২২। (স্মরণ কর), যখন তোমাদের দুইটি দল ভীরুতা প্রকাশ করিবার উপক্রম করিয়াছিল যদিও আল্লাহ তাহাদের উভয়েরই পৃষ্ঠপোষক ছিলেন; এবং মুমিনদের আল্লার উপরই ভরসা করা উচিত।

১২৩। এবং বদরে নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদিগকে সাহায্য করিয়াছিলেন, যখন তোমরা দুর্ব্বল ছিলে। অতএব আল্লাহকে আশ্রয় করিয়া চল, যেন তোমরা কৃতজ্ঞ হইতে পার।

১২৪। (স্মরণ কর) যখন তুমি মুমিনদিগকে বলিতেছিলে, তিন হাজার ফেরেস্তা নাযিল করিয়া তোমাদের প্রভু তোমাদিগকে সাহায্য করিবেন; তোমাদের জন্য ইহা কি যথেষ্ট হইবে না?

১২৫। হাঁ, নিশ্চয় হইবে, যদি তোমরা দৃঢ় থাক এবং খোদাকে আশ্রয় কর; এবং যদি তাহারা অতর্কিতে তোমাদের উপর আপতিত হয়, তীব্র বেগে আক্রমণকারী পাঁচ হাজার ফিরিস্তা দ্বারা তোমাদের প্রভু তোমাদিগকে সাহায্য করিবেন।

১২৬। সুসংবাদরূপে বৈ আল্লাহ ইহা বলেন নাই, যেন তোমাদের হৃদয় শান্তি লাভ করে। প্রাজ্ঞ ও পরাক্রমশীল আল্লাহর সাহায্যই সাহায্য।

১২৭। যেন কাফেরদের তিনি বিনষ্ট করিয়া দেন অথবা পরাভূত করিয়া দেন এবং বিফলকাম হইয়া তাহারা ফিরিয়া যায়।

১২৮। তাহাদের প্রতি তিনি সদয় হইবেন অথবা তাহাদিগকে শাস্তি দিবেন, তোমার ইহাতে কিছুই বলিবার নাই। তবে তাহারা নিশ্চয়ই অত্যাচারী।

১২৯। এবং আকাশ সমূহে এবং পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে, সমস্তেরই মালিক আল্লাহ। যাহাকে ইচ্ছা তিনি ক্ষমা করেন এবং যাহাকে ইচ্ছা তিনি শাস্তি দেন; এবং আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু।

১৪ রুকু ১৪ আয়াত ১৩০—১৪৩

১৩০। হে মুমিনগণ, তোমরা সুদ খাইও না, দ্বিগুণ চতুর্গুণ হারে; এবং আল্লাহকে আশ্রয় করিয়া চল যদি তোমরা সফলতা চাও।

১৩১। এবং সেই আগুনকে ভয় কর যাহা প্রস্তুত করা হইয়াছে (আল্লাহর বিধান) প্রত্যাখ্যানকারীদের জন্য।

১৩২। এবং আল্লাহ ও তাঁহার রছুলকে মানিয়া চল যেন তোমরা কৃপা লাভ করিতে পার।

১৩৩। এবং দ্রুত অগ্রসর হও তোমাদের প্রভুর ক্ষমার দিকে এবং সেই বেহেস্তের দিকে যাহার ব্যাপ্তি আকাশ সমূহ ও পৃথিবীময়, মুত্তাকীদের জন্য যাহা প্রস্তুত করা হইয়াছে।

১৩৪। সুদিনে ও দুর্দ্দিনে যাহারা দান করে, যাহারা ক্রোধ সংবরণ করে, এবং লোকদিগকে ক্ষমা করে। সদাচারিগণকে আল্লাহ ভালবাসেন।

১৩৫। এবং যাহারা আল্লাকে স্মরণ করে এবং কৃত পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে, যদি কখনও কোন কুকাজ করিয়া বসে অথবা নিজ আত্মার উপর অত্যাচার করে ফেলে; এবং আল্লাহ ব্যতীত আর কে পাপ ক্ষমা করিতে পারে? এবং জানিয়া বুঝিয়া তাহারা পাপ কাজে লাগিয়া থাকে না।

১৩৬। তাহাদের পুরস্কার হইবে তাহাদের প্রভুর নিকট হইতে ক্ষমা এবং এমন বাগান, যাহার নিম্ন দিয়া স্রোতস্বীনী প্রবাহিত আছে; সেখানে তাহারা চিরকাল বাস করিবে; এবং কত উত্তম তাহাদের পুরস্কার যাহারা সাধনা করে।

১৩৭। তোমাদের পূর্ব্বেকার বহু উদাহরণ রহিয়াছে। অতএব তোমরা পৃথিবী পরিভ্রমণ কর এবং (সমাগত নবীকে) মিথ্যা সাব্যস্তকারীদের পরিণাম দেখ।

১৩৮। মানব জাতির জন্য ইহা বিশদ বিবৃতি এবং মুত্তাকিগণের জন্য ইহা পথ প্রদর্শক ও উপদেশ।

১৩৯। এবং তোমরা শিথিল হইও না, বিমর্ষ হইও না, এবং তোমরাই বিজয়োন্নত হইবে, যদি তোমরা মুমিন হইয়া থাক।

১৪০। তোমরা যদি আঘাত পাইয়া থাক, তদ্রূপ আঘাত শত্রুপক্ষের লোকেরাও পাইয়াছে। এবং লোকদের মধ্যে এইরূপ দিন আমরা আবর্ত্তিত করিয়া থাকি; যেন আল্লাহ জানিতে পারেন, কে ঈমানদার এবং তোমাদের কাহাকে তিনি শহীদরূপে গ্রহণ করিবেন। এবং অত্যাচারীদিগকে আল্লাহ ভালবাসেন না।

১৪১। এবং যেন মুমিনগণকে আল্লাহ পরিশুদ্ধ করিয়া লন এবং কাফেরগণকে বিনষ্ট করিয়া দেন।

১৪২। তোমরা কি ধারণা করিয়াছ যে তোমরা বেহেস্তে প্রবেশ লাভ করিবে, অথচ আল্লাহ পরীক্ষা করিয়া দেখিবে না,—তোমাদের কে জেহাদ করিয়াছে এবং কে দৃঢ় রহিয়াছে?

১৪৩। এবং (জেহাদক্ষেত্রে) মৃত্যু দেখার পূর্ব্বে তোমরা মৃত্যুর সম্মুখীন হইবার কামনা করিতেছিলে। মৃত্যু এখন তোমরা চোখের সামনে দেখিতে পাইতেছ।

১৫ রুকু ৫ আয়াত ১৪৪—১৪৮

১৪৪। এবং মুহম্মদ রসুল বৈ আর কিছুই নহেন। তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী রসুলগণ অতীত হইয়া গিয়াছেন। তিনি যদি মরিয়া যান অথবা নিহত হন, তোমরা কি ফিরিয়া যাইবে? এবং কেহ ফিরে গেলে আল্লাকে সে একটুও ক্ষতিগ্রস্ত করিতে পারিবে না; এবং কৃতজ্ঞগণকে অচিরে আল্লাহ পুরস্কার দিবেন।

১৪৫। আল্লার আদেশে ব্যতীত কেহই মরিতে পারে না; সময় নির্দ্ধারিত আছে। এবং যে ব্যক্তি ইহজগতের পুরস্কার চায়, তাহাকে আমরা উহাই দান করি; এবং যে ব্যক্তি পরকালের পুরস্কার চায়, তাহাকে উহাই দান করি; অচিরে আমরা কৃতজ্ঞগণকে পুরস্কার দান করিব।

১৪৬। এবং (অতীতে) কত নবী যুদ্ধ করিয়াছেন এবং তাহাদের সঙ্গী ছিলেন আল্লার বহু উপাসক। আল্লার পথে দুঃখ ভোগের কারণে তাহারা শিথিল হয় নাই, দুর্ব্বলতাও দেখায় নাই, হীনতাও স্বীকার করে নাই; এবং আল্লাহ ধৈর্য্যশীলগণকে ভালবাসেন।

১৪৭। তাহারা এই কথা ছাড়া আর কিছুই বলিত না,—হে আমাদের প্রভু, আমাদের যাবতীয় পাপ ক্ষমা কর আমাদের সীমালঙ্ঘন ক্ষমা কর, এবং আমাদের পাদক্ষেপ দৃঢ় কর এবং কাফিরদের উপর আমাদিগকে বিজয় দাও।

১৪৮। অতএব পৃথিবীতে আল্লাহ তাহাদিগকে পুরস্কার দিয়াছেন এবং উত্তম পুরস্কার দিবেন পরকালে; এবং আল্লাহ সৎকর্ম্মশীলদিগকে ভালবাসেন।

১৬ রুকু ৭ আয়াত ১৪৫—১৫৫

১৪৯। হে মুমিনগণ, যদি তোমরা কাফিরদের কথা মত চল, তাহারা তোমাদিগকে পশ্চাৎগামী করিয়া দিবে এবং তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া পড়িবে।

১৫০। বরং আল্লাহই তোমাদের প্রভু এবং তিনি সর্ব্বোত্তম সাহায্যকারী।

১৫১। কাফিরগণের হৃদয়ে অচিরে আমরা সন্ত্রাসের উদ্রেক করিব, যেহেতু তাহারা আল্লার শরীক করে, যাহার জন্য কোন প্রমাণ তিনি নাযিল করেন নাই; এবং দুযখ হইবে তাহাদের বাসস্থান এবং বড়ই জঘন্য অত্যাচারীদের আবাসস্থল।

১৫২। এবং আল্লাহ তোমাদের নিকটে তাঁহার প্রতিশ্রুতি নিশ্চয় পূর্ণ করিয়াছেন, যখন তাঁহার আদেশে তোমরা তাহাদিগকে (কাফেরদিগকে) নিধন করিয়াছিলে, যতক্ষণ না তোমরা পদস্খলিত হইয়াছিলে এবং এই কাজে পরস্পর বিসম্বাদ করিয়াছিলে এবং রসুলের আদেশ অমান্য করিয়াছিলে, তোমরা কিসের প্রতি আসক্ত তাহা তোমাদিগকে দেখাইয়া দেওয়ার পর। তোমাদের কতক লোক পার্থিব মঙ্গল চায় এবং কতক লোক পরকালের মঙ্গল চায়। তোমাদিগকে পরীক্ষা করিবার জন্য অতঃপর তাহাদিগ (কাফিরগণ) হইতে তিনি তোমাদিগকে ফিরাইয়া রাখিলেন; তবে তিনি তোমাদিগকে ক্ষমা করিয়াছেন, যেহেতু মুমিনগণের প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহশীল।

১৫৩। এবং (সেই কথা স্মরণ কর) যখন তোমরা দূরে পলায়ন করিতেছিলে এবং পশ্চাৎ ফিরিয়া কাহাকেও দেখিতেছিলে না, এবং তোমাদের পশ্চাৎ হইতে রসুল তোমাদিগকে আহ্বান করিতেছিলেন। আল্লাহ তোমাদিগকে মনস্তাপের পর মনস্তাপ দিয়াছেন, যেন তোমরা যে সম্পদ হারাও এবং যে বিপদে পড় তাহার জন্য বিমর্ষ না হও এবং আল্লাহ অবগত আছেন তোমরা যাহা কিছু কর।

১৫৪। অশান্তির পর আল্লাহ তোমাদের উপর শান্তি অবতীর্ণ করিলেন। তোমাদের একদলকে ইহা তন্দ্রাবিষ্ট করিল এবং আর একদল নিজেদের চিন্তায় উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িল। তাহারা আল্লাহ সম্বন্ধে অজ্ঞতাপ্রসূত অলীক ধারণা করিল। তাহারা বলে, এই ব্যাপারে আমাদের কোন কর্তৃত্ব আছে কি? (হে নবী) তুমি বল, সব ব্যাপারেই কর্তৃত্ব একমাত্র আল্লার। তাহারা তাহাদের অন্তরে যাহা গোপন রাখিয়াছে তোমার নিকট তাহা প্রকাশ করিতে চায় না। তাহারা বলে, এই ব্যাপারে কর্তৃত্ব যদি আমাদের হাতে থাকিত, আমরা এখানে নিহত হইতাম না। (হে নবী) তুমি বল, তোমরা যদি তোমাদের গৃহেও থাকিতে, নিহত হওয়া যাহাদের জন্য অবধারিত ছিল, নিশ্চয়ই তাহারা তাহাদের বধ্য ভূমিতে উপনীত হইত। এবং এইভাবে আল্লাহ তোমাদের অন্তরের অবস্থা পরীক্ষা করেন এবং পরিশোধিত করেন। এবং আল্লাহ মানুষের অন্তরের অবস্থা সম্যক অবগত আছেন।

নবী, কবি ও দার্শনিক

(১ম পৃষ্ঠার পর)

বহু দার্শনিক ঐশীবাণীর সার্থকতা অস্বীকার করেছেন ইচড়পাকা স্বপ্নদ্রষ্টা ও 'মুলহামদের' স্বপ্ন ও ইলহামের অবিশ্বস্ততার কারণে। শতকরা পঞ্চাশ ষাট নম্বর পেয়ে যারা রসায়ন, পদার্থবিদ্যা বা বিজ্ঞানের অন্য কোন শাখায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সনদ লাভ করে, তারা যেমন বিজ্ঞানের মর্য্যাদা নির্ণয়ের মাপকাঠি হোতে পারে না, তদ্রূপ এই সব ইচড়পাকা মুলহামদের ইলহামকে ঐশীবাণীর সার্থকতা বিচারের মাপকাঠি মনে করলে ভুল করা হবে। বিজ্ঞানে যারা পারদর্শী হয়েছেন, বিজ্ঞানের মূল্য মর্য্যাদা নির্ণয় করতে হলে তাদেরকে সামনে রাখা দরকার। ঐশীবাণীর সার্থকতা বিচার করতে হোলেও তাদেরকেই সামনে রেখেই এ বিচার করতে হবে, যারা এ বিষয়ে পারদর্শী। অন্য কথায়, যারা নবী নন, তাদের ওয়াহী ইলহাম এই বিচারের মাপকাঠি হতে পারে না। নবীদের প্রতি আস্থাবান হওয়াই ঈমানের শর্ত; ওয়ালী দরবেশদের ইলহামের প্রতি আস্থাবান হওয়া ঈমানের শর্ত নহে।

অবশ্যই ওয়ালী দরবেশদের অবজ্ঞা করতে হবে না। শতকরা পঞ্চাশ ষাট নম্বর পেয়ে পাশ করা বি. এস. সি. ও এম. এস. সি.দের দ্বারা বিজ্ঞানের মর্য্যাদা যতটা রক্ষিত হয়, ওয়ালী দরবেশগণের দ্বারা ঐশীবাণীর মর্য্যাদা ততটাই রক্ষিত হয়।

মানবীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রত্যেক বিভাগেই অল্প সংখ্যক লোক থাকেন পারদর্শী এবং বেশীর ভাগ লোকই থাকে অপরিপক্ক। অপরিপক্কদিগকে পারদর্শীদের আসনে স্থান দিলে বা অপরিপক্কদের কারণে পারদর্শীদিগকে অবজ্ঞা করলে যেমন ভুল করা হবে, অপরিপক্কদের দ্বারাই যে পারদর্শীদের সাধনার ফল মানব সমাজে বিদ্যমান থাকে, এ কথা অস্বীকার করলেও তদ্রূপ ভুল করা হবে। জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভিন্ন শাখায় ক্ষুদে বৈজ্ঞানিকদের যে আসন। ঐশীবাণীবাদের ক্ষেত্রে ওয়ালী দরবেশদেরও অবিকল সেই আসন এবং তাদেরকে অবশ্যই তাদের প্রাপ্য শ্রদ্ধা নিবেদন করতে হবে।

ঐশীবাণীবাদের স্বরূপ বুঝতে দার্শনিকদের ভুল হওয়ার আর একটা বড় কারণ আছে। "এমন কোন জাতি নাই, যাদের মধ্যে নবী আসেন নাই" (কোরআন ১০ : ৪৭ ; ১৬ : ৩৬ ; ৩৫ : ২৪)। দার্শনিক গবেষণার জন্য এদের সকলের অভিজ্ঞতা সামনে রেখে বিচার করাই বাঞ্ছনীয়, কিন্তু সব নবীর অভিজ্ঞতা ত দূরের কথা, একমাত্র ইসলামের নবী মহম্মদ ছঃ আঃ অছাল্লাম ব্যতীত আর কাহারও সম্বন্ধে নির্ভরযোগ্য কোন ইতিহাস পাওয়া যায় না। এইরূপ ক্ষেত্রে দার্শনিক গবেষণা করা অবশ্যই অসম্ভব নহে, তবে এর জন্য যে বিকল্প উপায় অবলম্বন করা অপরিহার্য্য, অধিকাংশ দার্শনিকই তার প্রতি উদাসীন।

কোন বিষয়ে দার্শনিক গবেষণা করবার জন্য যে সব উপকরণ (data) পাওয়া যায়, তার সবগুলি সমান নির্ভরযোগ্য না হোলে নির্ভরযোগ্যতার ক্রমিক মান অনুসারে সেগুলিকে সাজাতে হয় এবং তারপর সর্ব্বাধিক নির্ভরযোগ্যকে প্রথম স্থান দিয়ে পর পর সবগুলি বিবেচনা করতে হয়।

সুধিগণ একবাক্যে স্বীকার করেন, মহম্মদ ছঃ আঃ অছাল্লামের প্রতি অবতীর্ণ ঐশীগ্রন্থ আল-কোরআন অবিকল রয়েছে। পক্ষান্তরে, কোরআনের পূর্ব্ববর্ত্তী কোন ঐশীগ্রন্থ অবিকল আছে বোলে দাবী করা নিতান্তই যারা ধর্ম্মান্ধ তাদের পক্ষে বৈ সম্ভব নহে। এই কারণে ঐশীবাণীবাদ যারা বুঝতে চান, কোরআন তাদেরকে উপদেশ দিয়েছে—"এই গ্রন্থ 'মুত্তাকীদের' পথ দেখাবে—যারা বিশ্বাস করে যা তোমার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে এবং যা তোমার পূর্ব্ববর্ত্তীদের প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছিল" (২ : ২)। অন্য কথায়, আধুনিকতম এবং সর্ব্বাধিক নির্ভরযোগ্য উপকরণের প্রতি প্রথমে মনোনিবেশ কর এবং অপরগুলি উহার আলোকে বিচার কর, সঠিক সিদ্ধান্তে পৌছতে পারবে।

আখবার আহমদীয়া

মহিলা-কর্ম্মীদের কার্য্যবিবরণী—

আল্লাহতালার অপার অনুগ্রহে মে মাসে তারুয়া আঞ্জুমনে আহমদীয়ার লাজনা এমাউল্লার (মহিলা সমিতি) কর্ম্মীদের প্রচেষ্টায় লাজনা কমিটির প্রেসিডেন্ট মোছাম্মৎ করিমনেছার সভানেত্রীত্বে বিভিন্ন মহল্লায় পাঁচটি তবলিগী জলসা অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

এই সকল মিটিংর ফলে জমাতের মহিলাদের সমবেতভাবে কাজ করার আগ্রহ বেশ বৃদ্ধি পাইয়াছে। সভার দিন আল্লাহর ফজলে লোক সমাগম বৃদ্ধি পাইতেছে। জমাতের মেয়েরা ছিলছিলার কিতাবাদী মনযোগ সহকারে পড়িয়া নারী মহলে প্রচার কার্য্য চালাইয়া যাইতেছেন।

আহমদীয়তের সত্যতা বুঝবার জন্য কয়েকজন গয়র আহমদী বোন আল্লাপাকের দরগায় দোয়ায় লাগিয়াছেন। জমাতের সকল ভগ্নিগণের খেদমতে দোয়ারত বোনদের পক্ষ থেকে তাদের হেদায়াৎ লাভের জন্য দোয়ার আবেদন জানান হইল।

প্রত্যেক মিটিংয়ে আমাদের প্রিয় নেতা হজরত আমীরুল মোমেনীনের স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য ও জমাতের তরক্কীর জন্য দীর্ঘ দোয়ার পর সভার কার্য্য শেষ করা হয়। —মিস্ হেনা, সেক্রেটারী, লাজনা এমাউল্লা, তারুয়া আঞ্জুমনে আহমদীয়া।

সম্পাদকের দফতর

(১)

Dear Sir,

I am a receiver of your 'Ahmadi' from time immemorial. At first I thought that Ahmadi, the mouthpiece of the Ahmadia Anjuman, will hamper true Islam. I am now convinced that it will hamper the formulary Moulvies. It will also be able to remove superstitions. I pray to Almighty so that Islam may become fresh and renewed mainly through the efforts of Ahmadia Anjuman.

Your faithfully
Qazi Shamsuddin Ahmad
Qazi Bari, Vill. Debnagar,
P. O. Dharmaghar, Dt. Sylhet.
East Pakistan.
22-4-55

(২)

জনাব

ছালাম জানিবেন। আমরা আপনাদের পাক্ষিক "আহমদী" পড়িয়া যারপর নাই আনন্দিত হইয়াছি। আপনারা যে মহান ব্রত নিয়ে কাজ করে চলেছেন, তার জন্য আমি আমার আন্তরিক অভিনন্দন জানাইতেছি। পত্রিকাখানিতে সময় সময় যে সারগর্ভ প্রবন্ধ ও কোরাণের ধারাবাহিক অনুবাদ হয়, তাহা পাঠ করিবার জন্য আমাদের মন স্বভাবত আকুল হয়ে উঠে। যদি আপনারা এই পত্রিকাখানি আমাদিগকে নিয়মিত পাঠকরূপে পড়িবার সুযোগ দেন তবে অত্যন্ত অনুগ্রহিত হইব। আশা করি আমাদের আবেদন বৃথা যাইবে না। ইতি

মোঃ আতিয়র রহমান
সেক্রেটারী, দৌলতপুর ষ্টুডেন্ট ক্লাব,
পোঃ শিবগঞ্জ, জিলা রাজশাহা,
ইষ্ট পাকিস্তান।
২৫-৪-৫৫

[সকল প্রবন্ধের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন। পাক্ষিক আহমদীর নাম উল্লেখ করিয়া যে কেহ ইহা হইতে উদ্ধৃত করিতে পারেন]

Printed at the AHMADI PRESS and published by Mvi. Anwarul Haque
from 4, Bakshi Bazar Road, Dacca.—Editor, G. S. Khadim, B.L.